ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 246-253
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.029

দিনাজপুরের গ্রামীণ সমাজে মনোহলী জমিদারির সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

সুরাট সরকার, *স্বাধীন গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশন, গঙ্গারামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
কামানুজ্জামান, *সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গঙ্গারামপুর কলেজ, গঙ্গারামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 31.10.2024; Accepted: 27.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

History is a living document of the past. Nothing is fixed in the world and nothing stays the same. Everything changes, time changes. The present becomes the past, the future becomes the present. But the past does not change, the past remains the past. It just takes time to rub it again and again. In the collision with time, some go under the dome of time, or endure adversity and sustain their existence. One such ancient dilapidated past is the Manohali Zamindari and zamindar house. This zamindar house is located in Tapan, 30 km from Balurghat, the capital city of Dakshin Dinajpur district. The building was built by Tarachand Bandyopadhyay, the zamindar of Sinni village in Katwar who established his zamindari in the area after the Battle of Plassey. At that time the construction cost of the building was 64000 rupees. Later generations of Zamindars were known to sympathize with the freedom fighters. Zamindar family members also actively participated in the freedom struggle. This Manohali village existed during a copper plate of Pala Emperor Madan Pala. The Manohali copper plate is found this Manohali village. Here is a lot of history, folklore, and folklore associated with it. This zamindar building has a wonderful and charming architectural display. This easily catches everyone's attention. A lot of ancient and modern Indian history is associated with this Manohali village and Manohali Zamindari.

Keywords: History, Past, Manohali, Zamindari, South Dinajpur, Tarachand Banerjee, Battle of Plassey.

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের এক বিশেষ জেলা হল দক্ষিণ দিনাজপুর। অবস্থানগত দিক থেকে এর তিনদিকেই রয়েছে আন্তর্জাতিক (বাংলাদেশ) সীমানার অবস্থান। এই জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল। এই জেলার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান গুলি হল- বাণগড়, টাউন ব্যাঙ্ক, মহিপাল নীলকুঠি, ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজির সমাধি, আতাশাহর দরগা বা মাজার, কালদীঘি, ধলদীঘি, তপন দীঘি, মহীপাল দীঘি ইত্যাদি। অভাব নেই প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের। জেলায় বর্তমানে রয়েছে মোট নয়টি থানা- বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর, কুশমন্ডি, হরিরামপুর, কুমারগঞ্জ, হিলি, বংশীহারী ও পতিরাম। এই

নয়টি থানার মধ্যে তপন থানার অন্তর্গত একটি বিশেষ গ্রাম হল মনোহলী। এই মনোহলী গ্রামের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আজ থেকে প্রায় নয় শতাব্দী পূর্বের পাল যুগের ইতিহাস। ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে পাল সিংহাসনে আসীন হন মদন পাল। তার শাসনকালের একখানি তাম্র শাসন পাওয়া গেছে এই মনোহলী গ্রামে। তার অষ্টম রাজ্য বর্ষে অর্থাৎ ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে এই তাম্রশাসনটি উৎকীর্ণ হয়। কোটিবর্ষ বিষয়ে ভূমিদানের উল্লেখ আছে এই লেখে। এই তাম্রশাসন থেকে কোটিবর্ষ বিষয়ের অধীন হলবর্ত মন্ডল এর কথা জানা যায়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এই মনোহলী গ্রাম থেকেই মদন পালের এই তাম্র শাসন টি আবিষ্কৃত হয়। গুপ্ত যুগের বিষয় ও মন্ডলের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি পাল যুগের পুরোপুরি বজায় থাকেনি এই তাম্রলিপি থেকে সেই চিত্র পরিষ্কার বোঝা যায়। সাধারণত বিষয়ের অধীনে মন্ডল কে রাখা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আবার মন্ডলের অধীনে বিষয়কে রাখা হয়েছিল। এ পরিবর্তনের অন্তরালে তাহলে কি কোনো কারণ ছিল? সে তো ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কী কারণ ছিল ইতিহাসে তার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায়নি। বহু শতাব্দী ধরে কোটিবর্ষ বিষয় ছিল রাজ্যের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। অথচ এই কোটিবর্ষকে প্রথম মহিপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বহুপূরণ প্রসিদ্ধ অমলকী মন্ডলের অধীনে রাখা হয়েছিল।[১] সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা মদনপাল। 'রামচরিত' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা প্রখ্যাত কাব্যকার সন্ধ্যাকার নন্দী তার সভাকবি ছিলেন। মদনপালের অগ্র মহিষী ছিলেন চিত্রমতিকা। বটেশ্বর স্বামী নামে জনৈক সামবেদী ব্রাহ্মণ এই ধর্মশীলা নারীকে মহাভারত পাঠ করে শোনাতেন। যদিও পাল সম্রাটরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম কেউ তারা সম্মান করতেন। এক বৎসরব্যাপী নিত্যদিন অপরাহ্ণে মহাভারত পাঠ করে শোনাবার দক্ষিণা স্বরূপ মদন পাল বটেশ্বর স্বামীকে কোটিবর্ষ বিষয়ের হলাবার্ত মন্ডলে একটি নিষ্কর গ্রাম দান করেছিলেন।[২]

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পর বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হয়। এরপর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানী লাভের পর বাংলায় 'দ্বৈত শাসনব্যবস্থা' গড়ে ওঠে। দেওয়ানির সনদ অনুযায়ী কোম্পানি বাংলায় মোগল বাদশাহের দেওয়ান হিসেবে কাজ করবে এবং নিজামত ক্ষমতা নবাবের হাতেই ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু বাস্তবে কোম্পানির রাজস্ব আদায় ও নিজামতের দায়িত্ব কোম্পানির মনোনীত মোহাম্মদ রেজা খানের ওপর অর্পিত হয়। এক কথায় কোম্পানি দায়িত্বহীন ক্ষমতা ও নবাব ক্ষমতাহীন যে দায়িত্ব লাভ করে তা ইতিহাসে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এরপর ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের পাঁচশালা বন্দোবস্ত, ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দের একশালা বন্দোবস্ত, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের দশশালা বন্দোবস্ত এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা ও জমিদারি ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এরকমই এক জমিদারি হল মনোহলী জমিদারি।

চিত্র: ছোট তরফের বাড়ির দুর্গা মণ্ডপের সম্মুখ

এই পর্যায়ে আমরা মনোহলী জমিদারি নিয়ে আলোচনা করব। মনোহলী জমিদারি বাড়িটি যা বর্তমানে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে তা নির্মাণ করেন যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মাণকাল সম্ভবত ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই মনোহলী জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বর্ধমানের কাটোয়ার সিন্নি গ্রামের জমিদার। সেখানেও ছিল তার বিরাট জমিদারি। দিনাজপুরের তৎকালীন মহারাজ টঙ্কনাথের নির্দেশে তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অঞ্চলে আসেন। মহারাজ টঙ্কনাথ তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় কে অনুরোধ করেছিলেন তিনি মহারাজের অনুগত হিসেবে এই অঞ্চলে থাকুন এবং স্থানীয় আঞ্চলিক উন্নয়নের কাজ করুণ। সেই সময় এই মনোহলী অঞ্চল বর্তমানের ন্যায় ছিল না, ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত। জমিদার বাড়ির পাশে একটি তেঁতুল গাছের কোটরে একটি বাঘও থাকতো বলে জানা যায় জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী ও স্থানীয় মানুষজনের লোককথায়। এই বাঘ গ্রামের গবাদি পশু তুলে আনত। একবার একজন কৃষককেও আঘাত করেছিল। পরে কৃষকটি মারা যায়। জমিদারদের দুটি হাতি ছিল। একটি মহিলা হাতি, যার নাম মদনপেয়ারি। সে ছিল খুবই বুদ্ধিমতী এবং শক্তিশালী ও ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন। আরেকটি পুরুষ হাতি ছিল, যার নাম তিনকড়ি। এই মদনপেয়ারি কে সঙ্গে নিয়েই জমিদার যোগেশচন্দ্র ও মহারাজ টঙ্কনাথের উদ্যোগে এই বাঘকে হত্যা করা হয়। বাঘটিকে গুলি করে হত্যা করেন মহারাজ টঙ্কনাথ, সঙ্গে ছিলেন জমিদার যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এ অঞ্চলে প্রথমে ছিল দুর্ধর্ষ ডাকার দলের উপদ্রব। এই ডাকাত দল স্থানীয় লোকজন ও পথচারীদের সর্বস্ব লুট করে তাদের সর্বস্বান্ত করত। এই ডাকাত দলের সঙ্গে আপোষ করেই প্রথমদিকে জমিদারি প্রতিষ্ঠা, এলাকা উন্নয়ন এবং আবাদি জমি উদ্ধারের কাজ করা হয় বলে জানা যায়। পূর্বের মতো বর্তমানের মনোহলীও রয়েছে শহর থেকে দূরে এক প্রত্যন্ত গ্রামে। যেখানে গ্রামীণ জীবনের সুন্দর সুন্দর চিত্রগুলি চোখে ধরে। এই জমিদার বংশের একটি সংক্ষিপ্ত বংশ লতিকা তুলে ধরা হলো-

মনোহলী জমিদার পরিবার (সংক্ষিপ্ত)

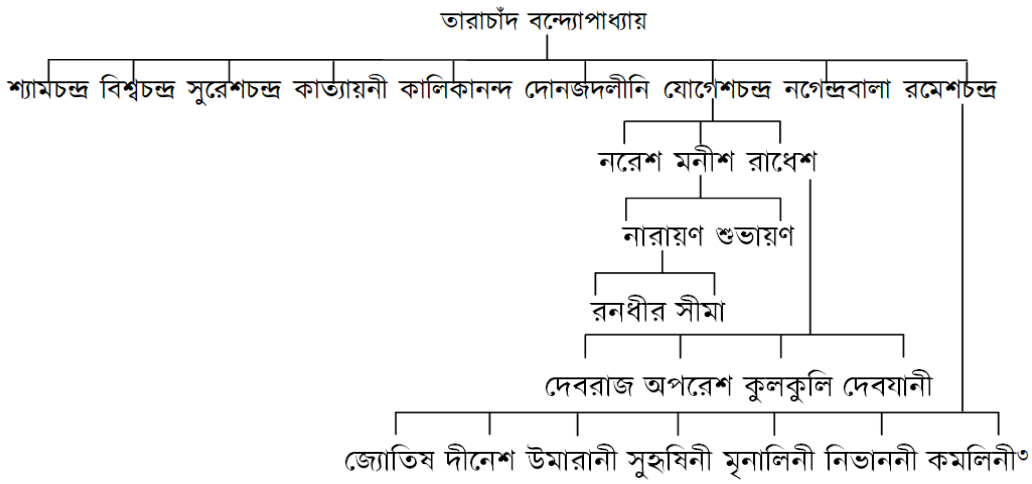

মনোহলী জমিদার বাড়ির সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্যপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান হল শারদীয়া দুর্গোৎসব। ছোট তরফের বাড়ির পাশে নির্মিত দুর্গামন্ডপে মহাসমারোহে এই দূর্গা পূজা হতো। জমিদার বংশের উত্তর পুরুষ রণধীর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গামন্ডপটি নির্মিত হয় এবং সে সময় থেকেই দুর্গাপূজা শুরু হয়। তার আগে তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে ছত্রাহার নামক স্থানে কাছারি বাড়িতেও দুর্গাপুজো হতো। তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই পুজো চালু করেছিলেন। মূলত পুজো শুরু করেছিলেন তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু মন্ডপ করে মহা সমারোহে যে দুর্গোৎসব হয় তা করেছিলেন তারাচাঁদ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো উপলক্ষে বিশাল আয়োজন হত জমিদার বাড়িতে। সারা মনোহলী গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষজনেরা আসতেন এই পুজো দেখতে। জমিদারদের তত্ত্বাবধানে হওয়া এই পুজোয় পাঁচ দিন ধরে বিভিন্ন আয়োজন হতো। এই পাঁচ দিন গ্রামের লোকজন এখানে খাওয়া-দাওয়া করত। এই পাঁচ দিন সমগ্র গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে অরন্ধন চলত। বিশাল সমারোহে চলত জমিদার বাড়ির পুজোর অনুষ্ঠান। যাত্রাগান, পালাগান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। পূজা উপলক্ষে মেলা বসত। জমিদার বাড়ি থেকে গ্রামবাসীদের বস্ত্র দান করা হতো। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে প্রচন্ড সমারোহে পুজো হতো। বিভিন্ন মিষ্টান্ন সহযোগে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হতো। এই পুজো হতো তন্ত্র মতে এবং মহা অষ্টমীর দিন বলি হতো। মহিষ বলি দেওয়া হত। বলি দেওয়ার জন্য বিশাল এক কাতলা এবং বিরাট লোহার খড়গ ছিল। জমিদার বাড়িতে আজও আছে সেই লোহার খড়গ। একটি পূর্ণবয়স্ক মহিষকে বলি দেওয়া হতো। নিয়ম ছিল বলির মহিষের এককোপে মাথা কাটার। বলির পর কাটা মহিষ মুন্ডু জমিদার একটি থালায় নিয়ে মায়ের কাছে উৎসর্গ করতেন। পরবর্তীতে মণীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে এই বলি বন্ধ হয়। এই বলি বন্ধের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক কাহিনি। জানা যায়, একবার বলির সময় যে মহিষটিকে বলির জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছিল না। ২০- ২৫ জন পাইক মিলেও তাকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিল। মণীশচন্দ্র মহিষের সামনে গেলে দেখেন মহিষের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরছে। তিনি অনুভব করেন এটি মহিষটির আকুতি তাকে না মারার। তখন মণীশচন্দ্র বলি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। এই নিয়ে সেই সময় মনীশচন্দ্রের সঙ্গে পিতা যোগেশচন্দ্রের প্রচন্ড বাগবিতন্ডা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিন মণীশচন্দ্র বলি হতে দেননি। মণীশচন্দ্র এই বলি প্রথা একেবারে বন্ধ করে দেন। পরবর্তীকালে মণীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বৈষ্ণব ভক্ত হন। পূর্বে তারা ছিল শাক্ত, শক্তির উপাসক। স্বামী নিত্যগোপাল দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন মণীশচন্দ্র। এই নিত্যগোপাল দেবের আশ্রম ছিল কলকাতায়।

চিত্র: ২০১২ সালে তৈরি নতুন দুর্গা মন্দির। এখানেই বর্তমানে গ্রামবাসীদের দ্বারা পুজা হয়

পুরনো মণ্ডপের পাশে রয়েছে একটি চামুন্ডা মূর্তি। পুজোর সময় ষষ্ঠীর দিন এই চামুণ্ডা মূর্তি টিকে পুজো করা হতো। বিজয়ার দিন বিসর্জন হতো বারোপঙ্খী নামে একটি পুকুরে এবং রীতি মেনে এখনো সেই পুকুরেই বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পর মূর্তির কাঠাম তুলে এনে পুরোনো দুর্গা মন্ডপে রাখা হয়। জমিদারি অবসানের পর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পুজোর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় গ্রামের পূজা কমিটির হাতে। জমিদারি বিলোপের পর লোকবল ও অর্থ বলের অভাব দেখা দিলে জমিদার বাড়ির সদস্য মনীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের লোকজন ডেকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি

গ্রাম কমিটি গঠন করে তাদের হাতে পুজোর দায়িত্ব তুলে দেন। পুরনো মন্ডপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভেঙে পড়ার ভয়ে গ্রাম কমিটি জমিদার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি নতুন মন্দির তৈরি করেছেন। ২০১২ সাল থেকে নতুন মণ্ডপে পূজা হয়। পুজোর দায়িত্ব বর্তমানে গ্রামবাসীরাই পালন করে এবং নিষ্ঠা সহকারে সুন্দরভাবে পুজো করা হয়। একটি গোলা রয়েছে, যার নাম 'ধর্মগোলা'। এই ধর্মগোলায় ধান মজুত করা হয় এবং সেই মজুত করা ধান এবং গ্রামের মানুষের মধ্য থেকে চাঁদা তুলে পুজোর খরচ চালানো হয় ।

মনোহলী জমিদার বাড়িতে হওয়া আরেকটি বৃহৎ উৎসব হলো ইচ্ছাময়ী কালী মায়ের পুজো। ইচ্ছাময়ী কালী মায়ের পূজো ছয় মাস হত ছোট তরফের বাড়িতে আর ছয় মাস হত বড় তরফের বাড়িতে। এই ইচ্ছাময়ী কালী মায়ের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দাঁইহাটের প্রখ্যাত শিল্পী নবীন ভাস্কর। এই নবীন ভাস্করই ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে রানী রাসমনির নির্দেশে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বিখ্যাত ভবতারিণী মূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন । নবীন ভাস্করের তৈরি প্রথম মূর্তিটি রয়েছে কলকাতার গোয়া বাগানের বাড়িতে, দ্বিতীয় মূর্তিটি হলো দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিনী মূর্তি এবং চতুর্থ মূর্তিটি হলো এই মনোহলী জমিদার বাড়ির ইচ্ছাময়ী কালী মায়ের মূর্তি। নবীন ভাস্কর কাঁচামাল হিসেবে কষ্টিপাথর সংগ্রহের জন্য বিহারের জামালপুরে একটি আস্ত পাহাড় কিনে নিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মূর্তির রূপকার হয়ে তিনি ভাস্কর্য শিল্পকে এক উচ্চপর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। দিনাজপুরের মহারানী তার শিল্পনৈপুণ্যে খুশি হয়ে তাকে একটি সোনার বাটালি উপহার দিয়েছিলেন।[৪] প্রতি বছরের পৌষ সংক্রান্তিতে ইচ্ছাময়ী কালী মায়ের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমারোহে পুজো হয়। তবে বর্তমানে এই কালীপূজারও সবটাই হয় বৈষ্ণব মতে। নেই কোন শাক্ত মতের প্রভাব, হয় না কোন বলি।

চিত্র: মনহলী ইচ্ছাময়ী কালী মাতা

প্রবেশদ্বার থেকে ছোট তরফের বাড়ি পার করে ভেতরের দিকে কালীর থান দেখা যায়। এর সাথে তান্ত্রিকের কালী আরাধনার স্থান। একসময় এখানে খোঁরাখুরি করতে কিছু প্রাণীর খুলি বেরিয়ে আসে। জমিদার বংশের উত্তর পুরুষ রণধীর বন্দোপাধ্যায় জানান, এখানে থাকতেন জমিদারদের তান্ত্রিক। তখন প্রাচীন জমিদার ও রাজাদের তান্ত্রিক রাখা হতো। এই তান্ত্রিক কে বলা হতো চৌধুরী তান্ত্রিক। তিনি এসেছিলেন বীরভূমের পাঁকুড় এলাকা থেকে। জমিদারদের উন্নতির জন্য তিনি এখানে তন্ত্রসাধনা করতেন।

বেজি, বিড়াল, বন-বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীর খুলি নিয়ে তন্ত্রসাধনা করতেন সেই তান্ত্রিক। তারপর হঠাৎই একদিন তিনি এখান থেকে চলে যান ।তার কোন হদিশ আর পাওয়া যায়নি।

এই মনোহলী গ্রামে রয়েছে একটি পুকুর। যার নাম মল্লিকাহার। পাল বা সেন বংশের এক রাজকুমারী মল্লিকার নাম অনুসারে এই নাম হয়েছে। রাজকুমারী মল্লিকা এখানে আসতেন এবং এই পুকুরে স্নান করে শিব মন্দিরে পুজো দিতেন। সেই শিব মন্দিরটির বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই। শিব মন্দিরটি এখন মাটির তলায় চলে গেছে। শিবরাত্রির দিনে এই মন্দিরে বিশেষভাবে পূজা হতো এবং রাজকুমারী মল্লিকাও পূজা দিতে আসতেন। এই পুকুর থেকে বিভিন্ন শিলালিপি, তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। যেগুলি বর্তমানে রয়েছে বালুরঘাট মিউজিয়াম ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে। এছাড়া এখান থেকে সেন আমলের কষ্টি পাথরের বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে।

চিত্র: বর্তমান মনোহলী পোস্ট অফিস ও প্রাচীন জমিদারি এস্টেটের থানা

গঙ্গারামপুর ফোয়ারা মোড় থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে মনোহলী গ্রাম। শহর থেকে দূরে অবস্থিত এই গ্রামে চোখে পড়ে সুন্দর গ্রামীন পরিবেশ। সুবিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের অপূর্ব সৌন্দর্য সহজেই নজর কারে। এই গ্রামেই রয়েছে সেই জমিদার বাড়ি যা মনোহলী জমিদার বাড়ি নামে পরিচিত। রাস্তা দিয়ে জমিদার বাড়িতে ঢুকতেই প্রথমে যেটি চোখে পড়ে সেখানে বর্তমানে মনোহলী গ্রামের পোস্ট অফিস রয়েছে৷ সে সময় এখানে ছিল জমিদারি এস্টেটের থানা। জমিদারি নিজস্ব পাইক, সিপাহী, বরকন্দাজরা এখানে থাকতো। জমিদার ভবনের দুটি আলাদা ভাগ রয়েছে। যেটি আগে তৈরি হয় তাকে বলা হয় বড় তরফ। জমিদার বাড়ির এই বড় তরফের ভবনটি তৈরি হয় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। অন্য অংশটি হলো ছোট তরফ। জমিদার বাড়িতে রয়েছে জলসাঘর। সেসময় সেখানে চলত নাচ, গান, বিনোদন। এই ছোট তরফের সঙ্গেই রয়েছে দুর্গা মন্ডপ। রাজমহলের পাথর, চুন, সুরকি দিয়ে মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছিল।[৫] ছাদ ছিল লোহার পাটাতনের উপর ঢালাই দেওয়া। এই পাঠাতন গুলি নিচ থেকে দেখা যায়। ছোটো তরফের ভবনের সামনে উঠানে রয়েছে তুলসী মন্দির। উঠোন পেরিয়ে রয়েছে ঘাট বাঁধানো পুকুর। ছোট তরফের বাড়িটি তৈরি হয় ১৮৯০ সালে, তৈরি করেন যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ডপ তৈরি হয় যে শৈলীতে তা হলো গ্রিক ও রোমান মিশ্র শৈলী। এই মন্ডপের খিলানগুলি দেখলেই তা সুন্দরভাবে বোঝা যায়। এই বাড়ি এবং মন্ডপ তৈরি হয় যে স্থপয়িতার নির্দেশে তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার। একজন ব্রিটিশ প্রকৌশলীর পরামর্শ এবং নকশা তেই এই ভবন এবং মণ্ডপটি তৈরি হয়েছিল। যদিও বর্তমানে সমগ্র ভবনটি ভগ্নপ্রায়। বর্তমানে দুর্গা মন্ডপটিকে ঘেরা দিয়ে রাখা হয়েছে।

চিত্র: জমিদার বাড়ির কিছু চিত্র

মনোহলী জমিদার পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়। মনোহলী জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশদের অনুগত হলেও যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র মণীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ছিলেন অনুশীলন দলের একজন সদস্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত

থাকার অপরাধে মণীশচন্দ্র বহুবার কারাবন্দী হয়েছেন। দিনাজপুরে স্বদেশীদের নেতৃত্বে যে রেল ডাকাতি হয় সেই রেল ডাকাতিতেও মণীশচন্দ্র জড়িত ছিলেন। এমনকি একসময় তাকে ধরার জন্য ব্রিটিশ সরকার হুলিয়া জারি করেন। মনীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুশীলন দলের সদস্য ছিলেন। নারায়ণচন্দ্র বহুবার ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। একবার দিনাজপুর শহরে যমুনা নদীর উপর একটি ব্রিজে ব্রিটিশ পুলিশ নারায়ণচন্দ্র কে লক্ষ্য করে গুলি করে। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পান এবং পুলিশদের থেকে পালাতে নদীতে ঝাপ দেন।

অতীতের সেই গৌরবময় মনোহলী জমিদার বাড়ি আজ অনেকটাই ধ্বংসের পথে। জেলার মানুষজন প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়িটির কথা এক প্রকার ভুলতেই চলেছে। সংস্কার এবং ইতিহাস বিমুখতার জন্য তা মানুষের স্মৃতির নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভবনের পালিশ খসে পড়েছে, ইটগুলি ক্ষয় হয়ে গেছে, জানালার লোহাগুলিতে মরিচা ধরেছে, ঘুণ ধরেছে কাঠে। অনেক স্থানে সৌন্দর্য লুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে যেভাবে আছে এভাবে চললে, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না হলে ভবিষ্যতে হয়ত ধ্বসে পড়বে এই বিশাল জমিদার বাড়িটি। যদিও জমিদার পরিবারের পক্ষ থেকে রক্ষণাবেক্ষণের অনেক ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে । কিন্তু তাই বা আর কতদিন!

তথ্যসূত্র*:*

(১) ধনঞ্জয় রায়, দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ৪২
(২) নির্মল সরকার, দিনাজপুরের না বলা কথা, আত্রাই প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২৮ মার্চ, ২০২২, পৃষ্ঠা- ১২৪
(৩) এই বংশ লতিকাটি তৈরি করতে সমিত ঘোষ- এর লেখা 'দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরাকীর্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস' বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।
(৪) বর্তমান পত্রিকা, ১৭ জানুয়ারি, বুধবার, ২০২৪
(৫) https://drishtibhongi.in
(৬) ব্যক্তি সাক্ষাৎকার: রণধীর বন্দ্যোপাধ্যায়। জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র হলেন এই রণধীর বন্দ্যোপাধ্যায়।